চিন্তন

‘শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা’

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

‘‘শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা/ অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে।’’ বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর করাল ছায়ায় আতঙ্কিত মানুষের কাছে এটি নিজের জীবন ও স্বজন হারানোর দুঃখকে নিয়ে কাব্য করা মনে হতে পারে। কিন্তু এ-গান যিনি লিখেছেন তাঁর অনুভব ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির তো একটি দিক নিশ্চয়ই আছে। তিনি জানাচ্ছেন, ‘‘সন্তানে দিতে কোল, ছাড়ি সুখকৈলাস/ বরাভয় রূপে মা শ্মশানে করেন বাস।’’ তিনি দেখছেন, ‘‘জননী শান্তিময়ী বসিয়া আছে ওই/ চিতার আগুন ঢেকে স্নেহ-আঁচলে।’’ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ‘‘মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্’’—আমিই সেই সর্বহরণকারী মৃত্যু। বিশ্বকবি হয়তো সেজন্যই বলেছেন, ‘‘মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান।’’ স্বামীজী চিঠিতে লিখছেন, ‘‘অহো সর্বরোগহর মৃত্যু।’’ আবার পওহারীবাবা সর্পদংশনে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বলেছিলেন, ‘‘আমার প্রিয়তমের কাছ থেকে দূত এসেছিলেন।’’ এঁদের সবার কাছেই মৃত্যু এক দিব্য উপহার—ঈশ্বরের দান। কিন্তু সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে মৃত্যু এক প্রহেলিকা, সমস্ত খুইয়ে এক অনির্দেশ যাত্রার বিভীষিকা এবং জীবনের সর্বাপেক্ষা অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু। অথচ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা-অনাকাঙ্ক্ষার পার, সে নিশ্চিতরূপে আছেই। ‘‘জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।’’ জন্ম হলে মৃত্যু হবেই আবার মৃত্যু মানেই পুনর্জন্ম অনিবার্য। এই দ্বিতীয় অংশটি অনেকে মানেন না। না মানতেই পারেন, কিন্তু প্রথম অংশটি মানতে হয় কারণ এটি আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা।

বস্তুত জন্ম থেকেই আমরা মৃত্যুর কোলে। তখন থেকেই আমাদের নির্দিষ্ট আয়ুর বিপরীত গণনার শুরু। কিন্তু মৃত্যুর কোলে শুয়েই আমরা জীবনের স্বপ্নে বিভোর। প্রতিটি জন্মদিন আনন্দ করে পালন করা শুধু ঘনিয়ে আসা মৃত্যুদিনটিকে পেছনে রাখার চেষ্টা। জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য কী?—বকরূপী ধর্মের এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির ততোধিক আশ্চর্য এক উত্তর দিয়েছিলেন—চতুর্দিকে মৃত্যুর মিছিলের আমরা যেন দর্শক এবং নিজেরা চিরজীবী এই ধারণা। উত্তরটি ততোধিক আশ্চর্য এই কারণে যে ধারণাটি নিছক সাধারণ অজ্ঞানপ্রসূত নয়। বরং যুক্তি, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা দিয়ে নিশ্চিতরূপে জেনেও আমাদের অনুভব অন্য কথা বলে। এটির কারণ বোধহয়, সেই এক অদ্বিতীয় অস্তিত্ব তার দ্বৈতভাবনার একহাতে চিরন্তন অস্তিত্ববোধ ও অপর হাতে এই শরীরকে ধরে আছে। তাই আমাদের এই

শরীর নিয়ে চিরজীবীর বোধ; এবং সেই কারণেই অহরহ চোখের সামনে অন্যদের দেহের বিনাশ আমাদের মনকে একবার ধাক্কা দিয়ে গেলেও প্রাণকে স্পর্শ করে না। কথামৃতকার 'শ্রীম' ভক্তদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। একদিন দেখলেন একটি ছাগশিশু বলির সময় তার অন্তিম আর্তনাদ শুনে অপর ছাগেরা কাঁঠালপাতা খাওয়া থামিয়ে মুহূর্তের জন্য ভীতচোখে তাকিয়ে রইল, এবং ক্ষণিক পরেই আবার খেতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই দেখেও না দেখার, জেনেও না জানার অদ্ভুত লীলানাট্য তার নাট্যকার সগৌরবে ঘোষণা করেন, ''দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া''—আমার এই দৈবী দুর্বার মায়া দুরতিক্রম্য। তিনি নিজেকে ধরার আমন্ত্রণ জানিয়ে চোখে ধুলো দিয়ে বেড়ান, এটিই তাঁর লীলা। কবির ভাষায় ''সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা/ সে যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে লাগায় চোখে ধাঁধা।'' এটিই সেই গোলোকধাম খেলার গোলোকধাঁধা, আমাদের ছেলেবেলায় যেটিতে ঘুঁটি তোলা দুরূহ ছিল।

যুক্তিবাদী পণ্ডিতেরা বলেন জীবনে স্বপ্ন দেখাই তো আসল, মৃত্যুচিন্তা তো নেতিবাচক চিন্তা, যে-চিন্তা মানুষকে সদা ভীত ও অকর্মণ্য করে ফেলবে। অবশ্যই তাই, যদি তা ভোগের দৃষ্টিতে দেখা হয়। কিন্তু যদি এই অবশ্যম্ভাবী বস্তুটিকে যোগের দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে সেটি আর নেতিবাচক থাকে না, ইতিবাচক হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক দৃষ্টিতে দেখা হলে একটি বিরোধহীন শান্তিময় জীবন যাপিত হয়। একটি উদাহরণ এরকম হতে পারে। আমরা দূরপাল্লার ট্রেনে সহযাত্রীদের সঙ্গে কত আপনার বোধে ব্যবহার করি, আত্মীয়তা পাতাই, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করি। কারণ আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে গন্তব্য এসে গেলে আমরা নেমে যাব এবং আর কোনওদিন দেখা হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই নিজেদের যাত্রাকে আনন্দময় করে নিতে তাদের সঙ্গে আপনার বোধে ব্যবহার করি। ঠিক সেইরকম, যিনি এ-জগতে তাঁর স্থিতিকে একটা অস্থায়ী সুযোগ বলে জেনেছেন তিনি এটির সদ্ব্যবহার করারই চেষ্টা করেন এবং অনর্থক বিরোধ, হিংসা, দ্বেষ দিয়ে জীবনকে নিরানন্দ করা থেকে বিরত থাকেন। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, ''অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত/ অব্যক্তনিধনান্যেব''—সমগ্র ভূত আদিতে অপ্রকাশ, মধ্যে প্রকাশ—যার নাম এই জীবন, আবার মৃত্যুতে অপ্রকাশ। একটি চলমান যাত্রার খানিক অংশ জীবনরূপে অনুভবযোগ্য। কবিগুরুর ভাষায় যার অনবদ্য প্রকাশ : ''জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা/ যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা।'' পা ফেললেই প্রকাশ, তুললেই নেই। আমরা পা তুলি ও ফেলি চলার পথে, এগোবার জন্য। ঠিক সেইরকম প্রকাশ ও অপ্রকাশ অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলি কীটাণু থেকে মনুষ্য হয়ে দেবতা বা ঈশ্বরের পথে, যতদিন না সেই অদ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে আমাদের মিলন হয়।

জীবন দৃশ্যমান, মৃত্যু আমাদের কাছে অদৃশ্য। জগদ্ব্যাপী এই অদৃশ্য মৃত্যুই কিন্তু সমস্ত ধর্মের জনক। চলমান এই জীবনগতিতে মৃত্যু একটা সাময়িক বিরতি এবং বিরল কিছু লোকের কাছে একটা স্থায়ী ধাক্কা, যা তাদের জিজ্ঞাসু করে তোলে। আর ধর্মমাত্রই এই জিজ্ঞাসুদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সাধনার পরিণতি। সেই কোন যুগে এইরকম কোনও জিজ্ঞাসু তাঁর সাধনার অবসানে আনন্দে চিৎকার করে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন, ''হে বিশ্ববাসী শোনো, তোমরা মরণশীল নও। তোমরা অমৃতের পুত্র। যে-অমৃতময় দিব্য পুরুষকে আমি জেনেছি, তিনিই তোমার সত্তা যাঁকে জানলে এই মরণশীলতাকে অতিক্রম করা যায়।''

জগতের সব ধর্মই পরলোকে বিশ্বাসী। বিশ্বাস

এই যে, মৃত্যুর পর কিছু অবশ্য থাকে, দেহের বিনাশে যার নাশ হয় না। সব ধর্মই একথা বললেও আমাদের সংশয় কিন্তু যায় না। আবার এই সংশয়ই মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করায়, কঠোপনিষদের কাহিনিটি তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন। বালক নচিকেতা পিতার যজ্ঞ দেখছেন। দেখছেন আহূত ব্রাহ্মণদের পিতা দান করছেন। এমন সময় শ্রদ্ধা নামক এক দৈবী সম্পদ নচিকেতাকে অধিকার করল। তিনি ভাবলেন যে, তাঁর পিতা—যিনি এই মরণশীল জগতের বাইরে যাওয়ার পাথেয় সঞ্চয় করছেন—তাঁর এত ঘোর বিষয়াসক্তি! যজ্ঞে প্রদেয় ব্রাহ্মণদের দানগুলি এত নিম্নমানের! তিনি ভাবলেন—আমি তো পিতার কাছে মূল্যবান তাই আমাকে তিনি যদি কাউকে দান করেন তাহলে তাঁর দান খানিকটা মর্যাদা পাবে। তিনি পিতাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আমাকে কাকে দান করছেন?’’ স্বভাবতই পিতা এই অদ্ভুত প্রশ্নে নিরুত্তর রইলেন। কিন্তু ছেলের পুনঃপুনঃ প্রশ্নে যজ্ঞে ব্যস্ত পিতা বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘‘তোমাকে মৃত্যুকে অর্থাৎ যমকে দান করলাম।’’

নচিকেতা ভাবলেন—হয়তো আমি উত্তম নই, কিন্তু অধমও তো নই, তবে যমকে আমায় দান করলেন কেন? আবার ভাবলেন এই দানে পিতার কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে হয়তো। তিনি সত্যরক্ষার্থে যমের কাছে চললেন। সেখানে পৌঁছে দেখলেন যম গৃহে নেই, কোথাও গেছেন। তিনি যমরাজের অপেক্ষায় তিনদিন অভুক্ত, বিনিদ্র অবস্থায় দ্বারে বসে রইলেন। যমরাজ ফিরে এসে দেখলেন এক বালক তাঁর অপেক্ষায় তিনদিন অভুক্ত বসে আছে। দুঃখিত যমরাজ তাঁকে বললেন, ‘‘তোমার এ-অবস্থার জন্য আমি দায়ী, অতএব এই তিনদিনের প্রতিদিনের জন্য একটি করে বর তোমার প্রাপ্য, তুমি গ্রহণ করো।’’ নচিকেতা পিতার সত্যরক্ষার্থে যমরাজ্যে এসেছেন, অতএব পিতা নিশ্চিতরূপে শোকসন্তপ্ত ও উদ্বিগ্ন। অতএব প্রথম বরে, তিনি পিতার পুত্র হারানোর দুঃখমোচন ও এই মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে যাওয়ার সময় হয়তো তাঁর নতুন শরীর হবে তাই পিতা যেন তাঁকে চিনতে পারেন এই বর চাইলেন। দ্বিতীয়টি যজ্ঞে করণীয় বিষয়ে। স্বর্গগামী মানুষেরা ঠিক কীভাবে যজ্ঞ করলে প্রার্থিত ফল লাভ করবে সেটি জানতে চাইলেন। সেই যজ্ঞের প্রকরণ যমের কাছে বিস্তারিত শুনে নচিকেতা নিখুঁতভাবে তা পুনরাবৃত্তি করে দেওয়ায় যমরাজ নচিকেতার ধীশক্তিতে মুগ্ধ। তিনি এই যজ্ঞটির নাম রাখলেন ‘নাচিকেত যজ্ঞ’।

নচিকেতার নিজের কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। প্রথম বর পিতার জন্য, দ্বিতীয় বর স্বর্গকামী পৃথিবীর মানুষের জন্য, শেষে তৃতীয় বর চাইলেন সমগ্র জগদ্‌বাসীর পক্ষ থেকে তাদের মৃত্যু সম্পর্কে সংশয় দূর করার উদ্দেশ্যে। বললেন, ‘‘যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে/ অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে’’—জগদ্‌বাসীর কাছে মৃত্যু এক প্রহেলিকা; তাদের গভীর সংশয় মৃত্যুর পর কিছু থাকে কি না, কারণ কেউ কেউ বলেন কিছু থাকে না, আবার অনেকে তাঁদের অস্তিত্ববোধ বিচার করে বলেন অবশ্য কিছু থাকে, এই বিষয়টি আমি নিশ্চিতরূপে জানতে চাই; সেটিই হোক আমার তৃতীয় বর।

প্রশ্নকর্তা বালক হলে কী হয়, অতি বিচক্ষণ, কারণ তিনি জানেন যে, মৃত্যু সম্পর্কিত জ্ঞান মৃত্যুর অধিপতির চেয়ে উত্তম দাতা আর কেউ হতে পারে না। যমরাজ দেখলেন আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান, যা লাভ করার যোগ্যতা দরকার। যদিও এ-বালক জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুপুরীতে এসে স্বয়ং যমরাজের কাছে এ-প্রশ্ন রেখেছে তবু তার যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চাইলেন। বললেন, ‘‘তোমায় বহুযুগব্যাপী আয়ু দেব এবং যত চাও ভোগৈশ্বর্য দেব; শুধু তাই নয়, তোমাকে সে-ভোগের যুগব্যাপী ক্ষমতাও দেব, তুমি তা গ্রহণ করো ও এই প্রশ্ন থেকে বিরত হও।’’ কিন্তু

ঋষি আমাদের আগেই জানিয়েছেন যে শ্রদ্ধা নামক এক দৈবীগুণ নচিকেতার মধ্যে প্রবেশ করেছে। স্বামীজী এই শ্রদ্ধা গুণটির ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং বলতেন এটি প্রতিশব্দহীন। 'একাগ্রনিষ্ঠা' শব্দটি এর কাছাকাছি হতে পারে। জ্ঞানার্জনের প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠা নচিকেতাকে প্রলোভিত হতে দিল না। তিনি বললেন, ''যত আয়ু বা ভোগৈশ্বর্যই আমাকে দিন, তার ক্ষয় অনিবার্য। আমার তাতে প্রীতি নেই, এই জ্ঞানই আমার প্রার্থনা।'' যমরাজ সন্তুষ্ট, শুরু করলেন আত্মবিষয়ক জ্ঞান যা কঠোপনিষদের প্রতিপাদ্য।

গীতাশাস্ত্রও শ্রীকৃষ্ণমুখে উচ্চারিত হল এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই। অর্জুন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে মৃত্যুভয়ে ভীত, কারণ সামনে কৌরবপক্ষে গুরুস্থানীয় শূরবীরগণ, কেউ হার স্বীকার করে পশ্চাৎপদ হওয়ার নন—বিশেষত ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য—যাঁরা আমৃত্যু লড়াই করবেন। হয় তাঁদের মৃত্যু হবে অথবা অর্জুনের নিজের মৃত্যু, যেকোনও একটা ঘটবেই। তাই জ্ঞানের ভান করে অর্জুন বললেন, ''যাঁদের হত্যা করে তাঁদের রক্তমাখা বিষয় উদ্ধার করব, তা ভোগ করার চেয়ে অরণ্যে বাস করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাপন অধিকতর শ্রেয়।'' শ্রীকৃষ্ণ বুঝলেন তাঁর এই বৈরাগ্যের পেছনে আছে মৃত্যুভয় ও মৃত্যু সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব। তাই প্রথমেই তাঁকে উপদেশ হিসেবে যা দিলেন তা এই মৃত্যু সম্বন্ধীয় জ্ঞান। বললেন, ''তুমি যে হত্যা, মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে জ্ঞানের কথা বলছ, তোমার কি ধারণা কৌরবপক্ষের বীরেরা এই জন্মের আগে ছিলেন না এবং মৃত্যুর পরেও থাকবেন না? জন্মালেই মৃত্যু অনিবার্য আবার সমান অনিবার্য মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম। যেমন পরিচ্ছদ জীর্ণ হলে তা ফেলে দিয়ে মানুষ নতুন পরিচ্ছদ গ্রহণ করে, তেমন এ-শরীরও জীর্ণ হলে তা ফেলে দিয়ে এই শরীরের অধিকারী নতুন শরীর গ্রহণ করে। যে-আদর্শের জন্য যুদ্ধ করছ সেটিই থাকবে, মনুষ্যশরীর আসবে যাবে। শরীর অনিত্য কিন্তু এ-শরীরের অধিকারী আত্মার বিনাশ নেই। জগতের কোনও আক্রমণই তাকে বিনষ্ট করতে পারে না। কর্মবশে এই জন্মমৃত্যুর চক্রে বারবার দেহধারণ করে সুখদুঃখ ভোগ করে, মৃত্যু ঘটে শরীরের—আত্মার নয়। তুমি আমি এরকম বহু জন্ম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গেছি যা আমি সব জানি কিন্তু তুমি জান না। সমগ্র জীব আদিতে অপ্রকাশিত, মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর অবসরে প্রকাশিত এবং অন্তিমে পুনরায় অপ্রকাশ অবস্থায় ফিরে যায়। এই জন্মমৃত্যুর চক্রে যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে শোকের কারণ থাকে না, আবার যদি এমন ভাবো যে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের সংযোগে এই চৈতন্যের উৎপত্তি আর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লিষ্ট হয়ে তার নাশ, তাহলে এই ক্ষণিকের অবস্থিতির জন্যই বা শোক কিসের?'' জগৎ জুড়ে মৃত্যুর করাল ছায়ার সম্মুখীন হয়ে আতঙ্কগ্রস্ত আমাদের সামনে এর চেয়ে বড় মানসিক শক্তির জোগান আর কোথাও নেই।

অর্থাৎ এ কেবল চক্রবৎ অনির্দেশ ঘূর্ণন নয়, এ অগ্রগতির এক প্রক্রিয়া। অতিক্ষুদ্র কীট থেকে মানুষ এবং তা থেকে বুদ্ধ, খ্রিস্ট পর্যন্ত নিরন্তর ক্রমবিকাশের পথ যা শারীরিক, মানসিক পেরিয়ে চৈতন্যের ক্রমপরিণতি।

এই জন্মপূর্ব অবস্থা ও মরণোত্তর অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই বলেই আমাদের সংশয় যায় না। তর্ক ওঠে অবিরত যে, যদি আমরা সত্যই পূর্বে থেকে থাকি তাহলে তার স্মৃতি আমাদের নেই কেন? তার উত্তরে বলা যায়, স্মৃতি অর্থাৎ জীবনের ঘটনাপঞ্জীর সংকলন আমাদের মনে সংরক্ষিত থাকে। এই দেহের দুটি ভাগ। প্রথমটি স্থূলদেহ, যা কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাহ্যকর্ম করে, আর দ্বিতীয়টি সূক্ষ্মদেহ—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার বা 'অন্তঃকরণ' বলে আমরা যাকে বুঝি। এর ওপরে কারণদেহ,

যেখানে অনন্ত কর্মসংস্কার বীজরূপে জমা আছে এবং সেই সংস্কারের খানিক এই সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহরূপ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর এ-জীবনের কর্মসংস্কার বীজরূপে কারণদেহে জমা হয়। পুনর্জন্মে আবার সেই সংস্কারের কিয়দংশ নতুন সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। যেমন বীজের মধ্যে গাছকে দেখা যায় না, যদিও তার মধ্যে সমগ্র গাছটি অব্যক্তরূপে আছে। সেরকম সেই কর্মসংস্কারের বীজে জীবন অব্যক্তরূপে ধরা আছে যা স্মৃতিরূপে বর্তমান মনে দেখা সম্ভব নয়। ঈশ্বর—যিনি নিজ মায়াকে আশ্রয় করে দেহ ধারণ করেন—একমাত্র তিনিই বলতে পারেন ‘‘তান্যহং বেদ সর্বাণি’’, আমি সেসব জন্ম জানি। তবে এ তো তত্ত্বকথা। সংশয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, কোনও বিষয়ের জ্ঞান বা স্মৃতির ওপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। আমাদের অতি শৈশবের স্মৃতি যেহেতু নেই অতএব সে-অবস্থা আমাদের ছিল না বলতে হয়। কিন্তু তথাপি তর্ক উঠতে পারে—আমাদের স্মৃতিতে না থাকলে কী হবে, আমাদের পিতামাতা, গুরুজনেরা তা দেখেছেন সুতরাং তাঁদের কথাই প্রমাণ। আমাদের মোটামুটি চার রকমের প্রমাণ নিয়ে চলতে হয়—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ। এই প্রমাণটি শাব্দ অর্থাৎ অপরের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করা। ঠিক এই প্রমাণকেই কাজে লাগিয়ে বলতে হয় যে যাঁরা জন্মমৃত্যুর এই চক্রের পারে গিয়ে আমাদের জন্য খবর এনেছেন, সেই সত্যসন্ধ, সত্যাশ্রয়ী মুনি-ঋষি এবং অবতারের কথা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ‘‘কুমোরেরা হাঁড়ি রোদে শুকোতে দেয়। দেখ নাই, তার ভেতরে পাকা হাঁড়ি আছে কাঁচা হাঁড়িও আছে। গরুটরু চলে গেলে হাঁড়ি কতক ভেঙ্গে যায়। পাকা হাঁড়ি ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলিকে ফেলে দেয়, তার দ্বারা আর কোনও কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমোর তাদের আবার লয়, নিয়ে চাকেতে তাল পাকিয়ে দেয়; নতুন হাঁড়ি তৈয়ার হয়। তাই যতক্ষণ ঈশ্বরদর্শন হয় নাই ততক্ষণ কুমোরের হাতে যেতে হবে, অর্থাৎ এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হবে।’’

মৃত্যু আমাদের নিঃশব্দে অনুসরণ করে। তার কোনও কালাকাল নেই। ক্রিকেটের আম্পায়ারের মতো আঙুল তুললে চলে যেতেই হবে। শাস্ত্র তাই বলেন যে মৃত্যু যেন চুলের মুঠি ধরে রয়েছে—এটি মনে করে ধর্মাচরণ করতে হবে—‘‘গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।’’ অনেকে গাইতে পারেন, ‘‘হেসে নেও দুদিন বইতো নয়/ কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়’’ (দ্বিজেন্দ্রগীতি) কিন্তু মৃত্যুর দিকে পেছন ফিরে হেসে নেওয়া যেতে পারে, তার কথা মনে পড়লে আর হাসি আসে না। গীতা বলছেন, ‘‘যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্/ তং তমেবৈতি...’’ (৮।৬)। যে যে-ভাব নিয়ে দেহত্যাগ করে সে সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলছেন, ‘‘আমি যদুমল্লিকের মাকে বলেছিলাম, যখন মৃত্যু আসবে তখন সেই সংসার চিন্তাই আসবে, পরিবার, ছেলেমেয়ের চিন্তা—উইল করার চিন্তা—এই সব আসবে; ভগবানের চিন্তা আসবে না। উপায় তাঁর নাম জপ, নাম কীর্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে মৃত্যুসময় তাঁরই নাম মুখে আসবে...। গীতার মতে, মরবার সময় যা ভাববে তাই হবে। ভরতরাজা হরিণ ভেবে হরিণ হয়েছিলেন।... মৃত্যু সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল। শেষ বয়সে নির্জনে গিয়ে কেবল ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নাম করা। হাতি নেয়ে যদি আস্তাবলে যায় তাহলে আর ধুলো কাদা মাখতে পারে না।... মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি কলকাতায় কর্ম করতে আসা।’’

আমাদের কর্ম উদ্দেশ্যহীন। ''ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।/ কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥'' (গীতা, ৩।৫) আমরা আমাদের প্রকৃতিগত গুণের দ্বারা অবশ হয়ে কর্ম করতে বাধ্য হই, এক মুহূর্তও কর্ম ছাড়া থাকতে পারি না। অনিত্য সংসার দুঃখময়, তাও সুখের সন্ধানরূপ কর্ম করে আমাদের জীবন কাটে; শুধু এক জীবন নয়; অনন্ত জীবনমৃত্যুর চক্রে ঘুরতে থাকি, যতদিন না আঘাতে আঘাতে জগতের অনিত্যতা ও সেখানে সুখের অসম্ভাব্যতা উপলব্ধি হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলছেন, যেমন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কলকাতায় কর্ম করতে আসি তেমনই এ-জগতে এসে আমাদের কর্মের উদ্দেশ্য নিরূপণ করে তাতে লেগে পড়তে।

তাই গীতা বলছেন, ''যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ''—যজ্ঞের কারণে কর্ম ছাড়া সব কর্মই বন্ধনের কারণ হয়। এখানে যজ্ঞ বলতে যে-কর্মে আত্মিক উন্নতি ঘটে, অর্থাৎ আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের বিস্তার, ব্যাপ্তি ঘটে। কাম্যকর্মের ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে মানুষ, আর তার পরিণতি—''জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি''—যিনি দ্বেষও করেন না আকাঙ্ক্ষাও করেন না তিনি সন্ন্যাসে প্রতিষ্ঠিত। স্বামীজী সন্ন্যাসের নতুন সংজ্ঞা দিচ্ছেন : সন্ন্যাসের অর্থ মৃত্যুকে ভালবাসা। ভালবাসা মানে মৃত্যুকে ডেকে আনা নয় বরং মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তিলে তিলে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করা, কারণ বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসীর জন্ম। বলছেন, অকর্মা হয়ে জীবনটাকে মরচে ধরিয়ে বিনষ্ট করার বদলে কর্মের মধ্য দিয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মৃত্যু ভাল। নচিকেতা যেমন সাহসের সঙ্গে মৃত্যুরাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মৃত্যুতত্ত্ব জেনেছিলেন, সেইরকম স্বামীজী আমাদের বলছেন মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করতে, তার মুখোমুখি দাঁড়াতে। ''সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়, মৃত্যুকে যে বাঁধে বাহুপাশে/ কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারই কাছে আসে।'' মৃত্যুকে অতিক্রম করতে তাকে নিশ্চিত জেনে বাহুপাশে বেঁধে তুচ্ছ করে রাখা। ''জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।'' রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই ভাব দিচ্ছেন : ''মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে ঘষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।... যাহার প্রাণ আছে তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয় সে-ই মরিতে কৃপণতা করে।... এই দুই রাস্তা আছে—এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে পৃথিবীতে সুখসম্পদ তাহাদেরই। যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।'' জগতে সমস্ত মহাপুরুষদের মধ্যেই আমরা এই পৌরুষ দেখতে পাই, আর সেই কারণেই তাঁদের শেষ নিঃশ্বাসটি পর্যন্ত জগৎকল্যাণে ব্যয়িত।

মৃত্যু নিয়ে মানুষের নানা প্রশ্ন, সংশয়। এসব থাকবেই। কারণ এ-সংশয় অনুভূত অজ্ঞানতা থেকে আসে। আমাদের যুক্তি, বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত বৌদ্ধিক জ্ঞান আমাদের অনুভূত অজ্ঞানতাকে দূর করতে পারে না। একমাত্র সত্যজ্ঞানের অনুভবই তা করতে পারে। আলোর কল্পনা অন্ধকার দূর করতে পারে না, একমাত্র সত্য আলোই তা করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজেরই ভাষায় যেন 'একডেলে গাছ'। ঈশ্বর বই কিছু জানেন না। তাই তাঁর এবিষয়ে বক্তব্যও একমুখী। তাঁর মৃত্যু নিয়ে আলোচনা ঠিক ততটুকু, যতটুকুর দ্বারা জগতের অনিত্যতা মানুষের বোধে আসে। কারণ এক এই অনিত্যবোধই মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে। তাই তিনি ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন, ''মৃত্যুকে মনে রাখা উচিত। এ জগৎ অনিত্য।'' এর বাইরে এ-সম্পর্কে আলোচনা বা প্রশ্নকে তিনি উৎসাহ দিতেন না। এক বৈষ্ণব একবার

তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আবার জন্ম কি হয়?''

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ''গীতায় আছে মৃত্যুসময়ে যে যা চিন্তা করে দেহত্যাগ করে তার সেই ভাব লয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়।''

বৈষ্ণব বললেন, ''এটি যে হয়, কেউ চোখে দেখে বলে তো বিশ্বাস হয়।''

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিক্রিয়া : ''তা জানিনা বাপু। আমি নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না আবার ম'লে কি হয়!... তুমি যা বলছ এসব হীনবুদ্ধির কথা। ঈশ্বরে কীসে ভক্তি হয় তার চেষ্টা করো। ভক্তিলাভের জন্যই মানুষ হয়ে জন্মেছ। বাগানে আম খেতে এসেছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষপাতা এসব খবরে কাজ কী? জন্মজন্মান্তরের খবর?''

মানুষের ক্ষুদ্রজীবনে কী করে নিত্য আনন্দলাভ হয় তার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুল। তাঁর একমাত্র উপদেশ—বাবুর বাগান ও তার ঐশ্বর্য দেখা নয়, যো সো করে ধাক্কা খেয়েও বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে হয় কারণ ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। বাবুর সঙ্গে আলাপ করতে পারলে এ-সংসার মজার কুটি, সব সংশয় দূর। একবার তার আনন্দ পেলে অন্য আনন্দ আর ভাল লাগে না। নাহলে—

''মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ
দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই।''

অতএব ''রাখো রাখো রে জীবনবল্লভে/ প্রাণমনে ধরি রাখো নিবিড় আনন্দ বন্ধনে।'' তবেই জীবন সার্থক।

বর্তমান যুগ তার ভোগমুখী জীবন নিয়ে এক মহা বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। মৃত্যুকে পেছনে রেখে ভোগের প্রচেষ্টা আজ মৃত্যুকে তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। আতঙ্ক, নৈরাশ্য, উদ্বেগ আজ চতুর্দিকে, যা রোগবীজাণুর চেয়ে বেশি সংক্রামক হয়ে ছেয়ে ফেলছে মানবজীবনকে। দেহের মৃত্যু একবারই হয়, কিন্তু মৃত্যুর আতঙ্ক মানুষকে জীবন্মৃত করে রাখে। এর থেকে উত্তরণের পথ মৃত্যুকে তার স্বরূপে দেখার চেষ্টা। এ-প্রসঙ্গে স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজীর বলা একটি ঘটনার কথা মনে হচ্ছে। মহারাজ তখন গঙ্গোত্রীর ওপরে পাহাড়ে এক সাধুর কাছে কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে বেদান্ত পড়েন। একদিন পাঠের সময় সাধুটি হাতের বইটি দেখিয়ে বলছেন, ''এই অষ্টাবক্রসংহিতা যা শেখাচ্ছেন সেটি তোমাদের অস্ত্র। তোমাদের হাতে খোলা তলোয়ার থাকতেও শত্রুর হাতে থাপ্পড় খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসছ। কারণ তুমি এই খোলা তলোয়ারটি সম্বন্ধে অবহিত নও। যদি সচেতন থাকতে পার তাহলে শত্রুবধ করে এগিয়ে যাবে।'' বেদান্তের শিক্ষা এই ভয়রূপী শত্রুজয়ের শিক্ষা, যা শেখায় এই শত্রুর মুখোমুখি হতে, তার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে নয়। Fear শব্দটি ভাঙলে দেখব তা বলছে—Face the Evil and Rise। স্বামীজী সে-অভীঃ মন্ত্র আমাদের দিয়ে গেছেন—

''জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার এ ভব ঈশ্বর, মন্দির তাহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা॥'' ✠